বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২১৫-২২৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

মুজিববর্ষে কোভিড-১৯: করোনাকালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বাজেট কতটুকু সহায়ক হবে?

মিহির কুমার রায়*

ভূমিকা

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে বিগত ৩রা জুন ২০২১ ইং তারিখে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট পেশ করেছিলেন বর্তমান সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যাকে বলা হয় করোনাকালের বাজেট। সেই হিসাবে বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'জীবন জীবিকার প্রাধান্য ও আগামীর বাংলাদেশ'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের তেরতম বাজেট এটি এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামালের এটি তৃতীয় বাজেট। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম বাজেট ঘোষণা করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ ১৯৭২ সালের ৩০ জুন, যার আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এটি বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের বাজেটের আকার বেড়েছে ৭৬৭ গুণ। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৯টি বাজেট উপস্থাপন করেছেন ১২ জন ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজন রাষ্ট্রপতি, ৯ জন অর্থমন্ত্রী ও দুজন অর্থ উপদেষ্টা। ব্যক্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি ১২টি করে বাজেট উত্থাপন করেছিলেন প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং ১০টি বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন আবুল মাল আবদুল মুহিত।

এই বাজেট ঘোষণায় করোনা ভাইরাসের মহামারি থেকে জীবন বাঁচাতে যেমন উদ্যোগ থাকছে, তেমনি জীবিকা রক্ষায় থাকছে নানান প্রণোদনা। প্রথমবারের মতো এবারও করোনা মোকাবিলা করে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। এতে করোনা থেকে মানুষের জীবন বাঁচাতে টিকা আমদানিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে, দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং নতুন কর্মসংস্থানে ব্যবসাবান্ধব বাজেট বলা হয়েছে। করোনা মহামারিতে বাড়ছে ব্যয়, আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে এবং সে হিসাবে কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না রাজস্ব আদায়। এতে আয় ও ব্যয়ের বড় ব্যবধানে বেড়ে যাচ্ছে ঘাটতির পরিমাণও। এমন পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো জিডিপির ৬ শতাংশের বেশি ঘাটতি ধরে করা হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট, যার আকার হচ্ছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ১৭.৪৭ শতাংশ, যা গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় নতুন বাজেটের আকার বাড়ছে ৬৪ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা। করোনার বছরেও ৭. ২ শতাংশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির হার ৫. ৩ শতাংশে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বিগত ১৬ মার্চ ২০১৮ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল একটি আনুষ্ঠানিক পত্রে জানিয়েছে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উত্তরণের তিনটি শর্ত পূরণ করেছে। এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা;
ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

বক্তৃতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে ১৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ওআইসি মহাসচিব এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশ ও জনগণের জন্য অবশ্যই আনন্দের বার্তা।
মূল শব্দ: *বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট · স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী · কৃষি পুনর্বাসন ও সারে ভর্তুকি · কোভিড-১৯ · প্রবৃদ্ধি*

২. বাজেটের বৈশিষ্ট্য

এই বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হলো করোনাকালে জনগনকে স্বস্তিতে রাখা বিশেষত স্বাস্থ্য, কৃষি তথা খাদ্য নিরাপত্তায়, সামাজিক নিরাপত্তায়, বিনিয়োগ-কর্মসংস্থানে, সামাজিক সুরক্ষার খাতের পরিধি বৃদ্ধিতে ইত্যাদি। তা ছাড়াও কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা, উত্তরণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), রূপকল্প ২০২১, এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়ন ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর লক্ষ্য সামনে রেখে যথাক্রমে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে উত্তরণের অনুষঙ্গ হিসেবে যেখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি (৮.২%) লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এবার বাজেটকে সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, সাধারণ সেবা এবং সুদ-ভর্তুকি-ঋণ প্রদানের আওতায় মোট চারটি বৃহত্তর খাতে বিভক্ত করে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিবেচনায় প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে স্বাস্থ্য খাতে ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি, যা মূল বাজেটের ৭.৬৮ শতাংশ। এরপরেই অগ্রাধিকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন ও সারে ভর্তুকি প্রদান, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসৃজন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ, গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার থাকছে।

চলতি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপির হিসাবে ৬.২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির ৬ শতাংশের সমান ঘাটতি এবং সে হিসাবে এবার বাজেট ঘাটতির আকার বাড়ছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, টাকার অঙ্কে প্রতিবছরই বাজেটের আকার বাড়ছে। কিন্তু করোনার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আয় কমে গেছে, সেই সঙ্গে কমেছে মানুষের ভোগব্যয়। এখন জোর দিতে হবে মানুষের কর্মসংস্থানে। সাধারণ মানুষের আয় বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতের দুর্বলতাগুলো কাটাতে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

৩. বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ও খাতওয়ারি বিভাজন

বাজেটে মোট আয়ের লক্ষ্য ধরা হচ্ছে ৩ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ১১ .৩৫ %), যা গত অর্থবছরে মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা এবং বর্তমান অর্থবছরের জন্য মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) থেকে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা,এ ছাড়া এনবিআরবহির্ভূত অন্যান্য খাত থেকে আদায় করার লক্ষ্য রয়েছে ৫৯ হাজার কোটি টাকা। করোনার এই সময়ে রাজস্ব আদায় লক্ষ্য অনুযায়ী হচ্ছে না, ফলে চলমান বাজেটে ব্যয় নির্বাহে ঋণ গ্রহণে চাপ বাড়বে। বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ধরা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া কর ছাড়া প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। করোনা মহামারি বর্তমান অর্থবছরে থাকবে, এমনটি ধরেই বাজেটে ব্যয় খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এতে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় বাড়বে। যে কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার ৫শ কোটি টাকা

যা জিডিপির ১০ .৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৩ লাখ ২৮ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিম ৪ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা এবং খাদ্য হিসাব হচ্ছে ৫৯৭ কোটি টাকা। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক বেড়ে যাওয়ায় চলতি বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গত অর্থবছরে ঘাটতি বাজেট জিডিপির ৫. ৯ শতাংশের মধ্যে এখনো রাখা হয়েছে। তবে চলমান বছর অনুদানসহ ঘাটতির পরিমাণ ৬.১ শতাংশ চূড়ান্ত করা হয়েছে যা টাকার অঙ্কে ২ লাখ ১১ হাজার ১৯১ কোটি টাকা। আর অনুদান ছাড়া ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা যাএটি জিডিপির ৬. ২ শতাংশ। সাধারণ ঘাটতি পূরণ করা হয় ঋণের মাধ্যমে। বাজেটে সহায়তা হিসাবে ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাত থেকে নেওয়া হবে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৭৯ হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া সঞ্চয়পত্র থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া হবে ৫ হাজার ১ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিদেশি ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯৭ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। ঋণ করার কারণে বিপরীতে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এ জন্য চলমান বছরে সুদ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা। এই বাজেটের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করার যে পরিকল্পনা রয়েছে এ ব্যয়ের বড় অংশ থাকবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অবকাঠামো উন্নয়নে যার মধ্যে এডিপিতে বরাদ্ধ রয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার৩২৪ কোটি টাকাা অনুমোদিত এডিপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৯৯ কোটি ৯১ লাখ ও বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন ৮৮ হাজার ২৪ কোটি ২৩ লাখ টাকা। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনের ১১ হাজার ৪৬৮ কোটি ৯৫ লাখ টাকার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন ৬ হাজার ৭১৭ কোটি ৪৮ লাখ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন ৪ হাজার ৭৫১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৪২৬টি প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ৩০৮টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১১৮টি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা করপোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৯টি প্রকল্পসহ মোট প্রকল্প ১ হাজার ৫১৫টি। খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০টি খাতে ২ লাখ ১০ হাজার ৪২১ কোটি, যা মোট এডিপির প্রায় ৯৩.৩৯ শতাংশ। এর মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রায় ৬১ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের প্রায় ২৭.৩৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪৫ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা (২০.৩৬%), গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি খাতে ২৩ হাজার ৭৪৭ কোটি (১০.৫৪%), শিক্ষা খাতে ২৩ হাজার ১৭৮ কোটি (১০.২৯%), স্বাস্থ্য খাতে ১৭ হাজার ৩০৭ কোটি (৭.৬৮%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে প্রায় ১৪ হাজার ২৭৪ কোটি (৬.৩৪%), পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি খাতে প্রায় ৮ হাজার ৫২৬ কোটি (৩.৭৮%), কৃষি খাতে প্রায় ৭ হাজার ৬৬৫ কোটি (৩.৪০%), শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে প্রায় ৪ হাজার ৬৩৮ কোটি (২.০৬%) এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রায় ৩ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা (১.৫৯%)।

৪. মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৩৩ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৮ হাজার ৪২ কোটি, বিদ্যুৎ বিভাগে ২৫ হাজার ৩৪৯ কোটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ২০ হাজার ৬৩৪ কোটি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ৫৫৮ কোটি, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে ১৩ হাজার কোটি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে ১১ হাজার ৯১৯ কোটি, সেতু বিভাগে ৯ হাজার ৮১৩ কোটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৮ হাজার ২২ কোটি এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৬ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ১০ প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৫৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া প্রকল্পের

তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১৮ হাজার ৪২৬ কোটি ১৬ লাখ টাকা), মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টে (৬ হাজার ১৬২ কোটি টাকা), চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রকল্পে (৫ হাজার ৫৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকা)। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) ৩ হাজার ৮২৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পে ৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পে ৩ হাজার ৫০০ কোটি, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে (৩ হাজার ২২৭ কোটি ২০ লাখ), এক্সপানশন অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া প্রকল্পে (৩ হাজার ৫১ কোটি ১১ লাখ ও হযরত শাহজালাল আন্ত র্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায় ১ম সংশোধিত) ২ হাজার ৮২৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা। অপর দিকে নতুন প্রকল্পে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ২ হাজার ৮৯৩ কোটি ও প্রকল্প ঋণ ১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন ৫৯৬টি প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দহীন অননুমোদিত নতুন ১৪১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া পিপিপি প্রকল্প ৮৮টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ৩৫৬টি। ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে জুন ২০২১-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আরো ৭৩টি প্রকল্প ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

৫. বাজেট বিশ্লেষণ

বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়—

(১) করোনাকালীন জীবন ও জীবিকার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও কার্যত নতুন বাজেটটি গতানুগতিক বাজেট হয়েছে। করোনার মধ্যে গত বছরের বাজেট বাস্তবায়নে অর্ধেক হওয়ার বিষয়টি আমলে না নিয়েই তৈরি করা হয়েছে বর্তমান অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব। প্রধানমন্ত্রী তার ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরের বাজেট সমাপনী বক্তৃতায় মহান জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, করোনা মোকাবিলা করে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন অর্থের কোনোরকম অভাব হবে না। এখন বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে, যা সরকার অবগত আছে। কিন্তু এর উন্নয়নের গতিধারায় কবে নাগাদ এই সক্ষমতা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌছাবে তা বলা দুষ্কর। এর জন্য প্রশিক্ষণ ও তদারকির কোনো বিকল্প নেই সত্যি। কিন্তু একটি রোডম্যাপ ধরে আগাতে হবে। প্রায়শই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পগুলোর ব্যয় দক্ষতা, ব্যয়ের মান নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন শোনা যায়।

(২) কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো আরো প্রকট হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১.৩ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৭.২ শতাংশ। কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে মাত্র ২১ শতাংশ ব্যয় করতে পেরেছে। এমনকি ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১০০ কোটি টাকা স্বাস্থ্য গবেষণায় বরাদ্দ ছিল অথচ খরচ হয়নি বরাদ্দের এক টাকাও বিধায় এ খাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং প্রয়োজন। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ বিষয়ে গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ ও তার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ

অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ ও মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে, সেক্ষেত্রে এ বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল অসংক্রামক রোগের বিস্তৃতি ও চিকিৎসায় ব্যক্তিগত ব্যয়ের উচ্চহারের কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। এখন করোনাকালে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন চিকিৎসক-কর্মী নিয়োগ, করোনা মোকাবিলার জন্য কিট, পিপিই, মাস্ক, অক্সিজেন ও মেডিসিন সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। দেশে প্রাথমিক-মাধ্যমিক পর্যায়ে সেবার অগ্রগতি ভালো; কিন্তু উচ্চ সেবায় স্বাস্থ্য ববস্থা আইসিইউ, ভেন্টিলেশন ইত্যাদিতে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯১৯ এর মোকাবিলায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এরপর প্রসঙ্গটি হলো বৈশ্বিক অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের আমদানি-রপ্তানিতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে সময় লাগবে। তার সাথে যুক্ত হতে পারে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মহীনতা, ভোগ চাহিদা ও সরবরাহ চেইনে বাধা, রাজস্ব আদায়ে স্থবিরতা ইত্যাদি।

গতানুগতিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম, যা গত একদশক ধরে বাংলাদেশ গড়ে জিডিপির শতকরা মাত্র ২ ভাগ বা তারও কম আর বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ ব্যয় করছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। উন্নত দেশগুলোতে এই হার শতকরা ১০ থেকে প্রায় ২০ ভাগ। মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার গড় মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় বাংলাদেশ থেকে ৪ গুণেরও বেশি। এছাড়া মহামারির সময় জরুরি প্রয়োজন মেটাতে বাজেটে এবারও ১০ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক থেকে করোনা টিকা কিনতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য ১৪ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে, যা ইতোমধ্যে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমান ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু অগ্রাধিকারের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচি অন্যতম। সরকার দেশের সব নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করবে, এ জন্য যত টাকাই লাগুক সরকার তা ব্যয় করবে। সে লক্ষ্যে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দের বাইরে টিকা কিনতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে দেড় বিলিয়ন ডলারের ভ্যাকসিন সাপোর্ট পাওয়ার কথা রয়েছে। টিকা সংগ্রহে চলতি অর্থবছরে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক ৩ হাজার কোটি টাকা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষায় বিশ্বে বিনামূল্যে টিকা প্রদানকারী দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক থেকে কোভিড-ভ্যাকসিন কিনতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য ১৪ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবহৃত হচ্ছে। টিকা কিনতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৯৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার লক্ষ্যে ঋণচুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এবং এআইআইবি হতে ভ্যাকসিন কেনার জন্য সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। মোট ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনার জন্য ভাগ ভাগ করে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে টিকা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি মাসে ২৫ লাখ করে টিকা দেওয়া হবে। বর্তমান বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে জাতীয়ভাবে টিকা দেওয়া শুর হয়। এখন পর্যন্ত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ১ কোটি ২ লাখ ডোজ, চীনের সিনোফার্মের ৫ লাখ ডোজ এবং কোভ্যাক্স থেকে ফাইজার-বায়োএনটেকের ১ লাখ ৬২০ ডোজ টিকা এসেছে। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিশিল্ড প্রয়োগের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। তিন কোটি ডোজ টিকা কিনতে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তবে মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে সরকারের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে সেরাম ইনস্টিটিউট দুই চালানের পর আর টিকা

পাঠাতে পারেনি। এতে দেশে টিকাদান কর্মসূচি বড় ধরনের হোঁচট খেলে নতুন উৎস থেকে টিকা কিনতে তৎপর হয় সরকার। এর অংশ হিসাবে চীনের সিনোফার্ম ও রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি টিকা পেতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সিনোফার্মের কাছ থেকে টিকা কেনার প্রস্তবও সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। উপহার হিসাবে চীনের কাছ থেকে পাওয়া এই টিকা দেশে প্রয়োগও শুরু হয়েছে। রাশিয়ার কাছ থেকে স্পুটনিক-ভি কেনার জন্য সরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে। আর ফাইজার-বায়োএনটেকের তৈরি এক লাখ ৬২০ ডোজ টিকা বাংলাদেশ পাচ্ছে কোভ্যাক্স থেকে। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ফাইজার ও জার্মান জৈবপ্রযুক্তি কোম্পানি বায়োএনটেকের তৈরি করা করোনা ভাইরাসের টিকা বাংলাদেশে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। এ নিয়ে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের মোট চারটি টিকা অনুমোদন পেল। এর আগে কোভিশিল্ড, স্পুটনিক-ভি ও সিনোফার্মের তৈরি টিকার অনুমোদন দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প গত অর্থবছরে বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরেও তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। সরকারিভাবে ঢাকায় ৭২টি ও ঢাকার বাইরে ৪৯টিসহ মোট ১২১টি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত আরটিপিসিআর ভিত্তিতে ৫৮ দশমিক ১৯ লাখসহ মোট ৫৯ দশমিক ৪৮ লাখ মানুষের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৪২৩টি) এর প্রতিটিতে ৫টি করে আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেসব জেলায় মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে জেলাসদর হাসপাতালগুলোতে ১০-২০টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে। দায়িত্ব পালনকালীন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানি বাবদ চলতি বছরে বরাদ্দকৃত ৮৫০ কোটি টাকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকায় দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চালু রয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। রিয়েল টাইম হসপিটাল ড্যাশবোর্ড স্থাপনের ফলে দেশের কোভিড হাসপাতালসমূহের সাধারণ ও আইসিইউ শয্যার সব তথ্য যেকোনো মুহূর্তেই পাওয়া যাচ্ছে।

বর্ণিত অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যখাতে সরকারের আয়োজনের কোনো কমতি নেই। কিন্তু উদ্যোগের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে, যা গোছানো জরুরি। কাজেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী, বাজেটের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত দ্রততম সময়ে জনগণের কমপক্ষে ৭০ শতাংশের টিকাকরণের কৌশল নির্ধারণ করা। বাজেটে বলা হয়েছে, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলাসদর হাসপাতালগুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কাজ চলমান আছে। এক্ষেত্রে উপজেলাপর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতেও যতটা সম্ভব আধুনিক স্বাস্থ্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বাড়াতে হবে, যাতে বড় বড় শহরের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কম পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরও সব জেলা হাসপাতালে আইসিইউ সুবিধা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি গত একবছরে। কারণ, এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জনবলের অপর্যাপ্ততা। স্বল্প মেয়াদে এটি করা সম্ভব না হলেও মধ্য মেয়াদে কাজটি অবশ্যই করতে হবে। আসলে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাস্তবায়নই মূল চ্যালেঞ্জ, যা করোনাকালে স্পষ্ট হয়েছে। গত অর্থবছরে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৫০ শতাংশেরও কম। এটি কেন

কম, অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হলে কেন হচ্ছে—মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, সর্বোপরি অপচয়। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরূপণ ও সমাধানের পন্থা বের করা দরকার। ব্যয়ের সক্ষমতা নেই বলে বরাদ্দ কম না রেখে সক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই উপায় বের করতে হবে। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করে বিধায় স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দে নগর-গ্রামের অনুপাতও ন্যায্য হওয়া দরকার। সর্বোপরি অর্থের বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে করোনা মোকাবিলা করে অর্থনীতিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ৬৬ হাজার ৪০১ কোটি টাকা, যা জিডিপির ২.১ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ১১.৭ শতাংশ। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে হলে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ এবং মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তার চেয়ে কম রয়েছে। করোনাপরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে বিধায় শিক্ষার্থীদের সংক্রামক রোগ থেকে নিরাপদ রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় নিয়ে অতিজরুরি ভিত্তিতে শিক্ষানীতিসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে;

(৪) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার প্রধান বাহক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পল্লী উন্নয়নের কথায় এলেই কৃষি সবার আগে চলে আসে। বর্তমানে কৃষিখাতে জিডিপির হার প্রায় ১২ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে শষ্য খাতের অবদান সর্বাগ্রে রয়েছে। যেতেতু কৃষি পল্লী উন্নয়নের একটি বড় খাত, তাই সরকার বাজেটে কেবল কৃষিখাতে ১৬,১৯৭ কোটি টাকা বর্তমান বছরে রাখা হয়েছে। আবার তার সাথে যদি মৎস্য, পশুসম্পদ, বন ইত্যাদিকে যোগ করলে সার্বিক কৃষিখাতে বাজেট দাঁড়ায় ৩১ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা, যা মূল বাজেটের ৫.৩ শতাংশ। কাজেই ব্যাপক অর্থে পল্লীী উন্নয়ন খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তা উন্নয়ন বাজেটের ২৯.৬ শতাংশ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের ২০.২ শতাংশ বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে উল্লেখ্য, কৃষি যেহেতু একটি অগ্রাধিকারভুক্ত খাত এবং খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টির এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই গত বছরগুলোতে এই খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল ৩২ হাজার ৫০২২ কোটি টাকা, যা গড়ে প্রতিবছর দাঁড়ায় ৬৫০১.৪ কোটি টাকা এবং চলতি বছরের বাজেরট ভর্তুকি রাখা হয়েছে ১০ হাজার ০৯৯ কোটি টাকা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মনে করছে, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, কৃষি গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষির বহুমুখীকরণ, রপ্তনীমুখী কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদিতে জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান বছরের বাজেটে অথনীতির প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) যে টার্গেট ধরা হয়েছে তা অর্জনে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় সেই খাতে প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে বলে কৃষি অথনীতিবীদরা মনে করেন। কোভিড-১৯ দেখিয়ে দিয়েছে, রপ্তানিমুখী চিন্তা পরিহার করে গ্রামীণ অর্থনীতি ও খাদ্য উৎপাদন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিডের কারণে ভারতসহ অনেক দেশের জিডিপিতে যেখানে নেতিবাচক সূচক পরিলক্ষিত, সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে খাতগুলো প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে, কৃষি তার মধ্যে প্রধানতম। এই অকালেও বাংলাদেশের জিডিপিতে গড় প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের মতে ৩. ৬ শতাংশ, এডিবির মতে ৫. ৫-৬ শতাংশ এবং সরকারি তথ্যমতে ৫.২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি যা-ই হোক না কেন, তা অর্জিত হয়েছে মূলত কৃষি, প্রবাসী আয় এবং

পোশাক রপ্তানি খাত থেকে। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে ও যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বছরে বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সাথে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০ শতাংশ- ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে তথা এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সময় ও শ্রম খরচ কমবে, কৃষক লাভবান হবে ও বাংলাদেশের কৃষিও শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে। কৃষিযন্ত্রের প্রাপ্তি, ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামত সহজতর করতে অত্যন্তগু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চাই। বর্তমানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা আমরা কমিয়ে আনতে চাই। ইতিমধ্যে আমরা ইয়ানমার, টাটাসহ অনেক কোম্পানির সাথে কথা বলেছি, তাদের অনুরোধ করেছি যাতে তারা বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করে"। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সাথে ফসলের নিবিড়তা বাড়বে ও চাষ ত্বরান্বিত হবে।

কৃষিখাতের বছরের বাজেট পর্যালেচনায় দেখা যায় মুরগি, মাছ ও গবাদি পশুরখাবার তৈরির উপকরণ আমদানিতে কাঁচামালে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, নিড়ানি, ঝাড়াই কল, কম্বাইন্ড হারভেস্ট, থ্রেসার, রিপার, পাওয়ার টিলার, সিডার ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, যা সামগ্রিক কৃষির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। কৃষিখাতের এই বজেটকে সাধুবাদ জানাতে চাই। কিন্তু কভিডে লকডাউনে আমরা লক্ষ্য করেছি, পণ্য যে অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না, সেখানে তার আকাশছোঁয়া দাম। আর যেটি উৎপন্ন হয় তা কৃষক বিক্রি করতে পারছেন না। রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাজেটে সেসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা নেই। এ রকম বাস্ড়বতায় কৃষি খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩. ৬ শতাংশ, মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ, কৃষি খাতের বাজেটও বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ। এখন প্রশ্ন হলো, কভিডের কারণে বিদেশ থেকে যে শ্রমিকরা দেশে ফিরে এসেছেন এবং এখনও বিদেশে যেতে পারেননি, শহর থেকে কাজ হারিয়ে যারা গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের কর্মসংস্থান কিংবা তাদের শ্রম বিনিয়োগ কিভাবে ঘটবে তার তেমন কোনো উল্লেখ বাজেটে নেই তথ্য বলছে বিগত বছর গুলোতে জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ অবহেলিত হয়ে এসেছে এবং কৃষি খাতে ভুর্তুকি অন্যান্য বারের মত এবারেও একি অবস্থা রয়েছে। এখন আসা যাক বিনিয়োগের প্রসঙ্গে যা বর্তমান বছরের বাজেট উন্নয়ন খাতে কৃষি মন্ত্রনালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩,০৩০ কোটি টাকা যা ২০২০-২১বছরের সংশোধিত বাজেট ছিল ২.৩৯৭ কোটি টাকা (যা ঘোষিত ২৫৪৪ কোটি টাকা বিপরীতে)। আবার যদি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে জিডিপিতে এর হার মাত্র ২২ শতাংশ, যা গত কয়েক বছর যাবত স্থবির হয়ে আছে। আবার ব্যাংকিং খাতের হিসাবে দেখা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাক্তি পর্যায়ে যে বিনিয়োগ হয়েছে তা সামষ্টিক অথনীতির বিবেচনায় মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ এবং এতে কৃষি থাতের অংশ আরও কম অথচ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি বাজিন্যকরনের উপর জোড় দেওয়া হয়েছিল যেখানে

পরিবার ভিত্তিক চাষাবাদকে পরিহার করে খামার ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদকে (গ্রিন হাউজ) উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছে, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিরা অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারাছে না। বাজার ব্যবস্থাপনায় এসব কৃষকের কোনো প্রবেশাধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার প্রমাণ কৃষিপণ্য বিশেষত কৃষকের ধানের মূল্য না পাওয়া যার প্রভাব পড়েছে ক্রমাগতভাবে কৃষি প্রবৃদ্ধির হ্রাস পাওয়ায়। কৃষি বাজেটের আরও দিক হলো কৃষির প্রক্রিয়া যেহেতু গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত তাই এর গতিশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৩৫ হাজার ২৯ কোটি টাকা (বাজেটের ৭.৪৮ শতাংশ), নদীভাঙ্গন রোধ ও নদী ব্যবস্থাপনার জন্য পানিসম্পদ খাতে ৬ হাজার ৮৭১ কোটি টাকা (বাজেটের ২.৭৯ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত মিলিয়ে বর্তমান অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৬ হাজার ৯ শত ৪৭ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরে ছিল ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি ৬৭৭ লাখ টাকা (হিসাবমতে বেড়েছে ৭১৩ কোটি টাকা)। তথ্য থেকে জানা যায়, এডিপিতে বিগত ও বর্তমান মিলে মোট ১ হাজার ৫১৫টি প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ৩ শত ৮টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১১৮টি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প ৮৯টি। এসব প্রকল্পের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প রয়েছে ১৫৬টি (চলমান রয়েছে ৫০ শতাংশ, ২৮ শতাংশ সমাপ্ত এবং ১৯ শতাংশ কোভিড ওভার প্রকল্প) এবং সমাপ্ত প্রকল্পগুলো দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৫ হাজার কোটি ও ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ৭৮.৭ শতাংশ ও ৫৯ শতাংশ্ লোন বিতরণ সম্ভব হয়েছে ও ২ লাখ সুফলভোগী এর আওতায় এসেছে। বিশ্বব্যাপী মোট খাদ্য উৎপাদনের ৮০ শতাংশই আসে পারিবারিক কৃষির মাধ্যমে, যার বিবেচনায় জাতিসংঘ ইতিমধ্যে (২০১৯-২০২৮) পারিবারিক কৃষি দশক ঘোষণা করেছে এবং একটি বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনাও চূড়ান্ত করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার আলোকে জাতীয়পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার এবং কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার নকশা তৈরি অত্যন্ত জরুরি, যার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, সংরক্ষণাগার, যান্ত্রিকীকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও পারিবারিক কৃষির উন্নয়ন, কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা এবং জৈব কৃষি বা জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষিচর্চায়, যার মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে; দেশের অগণিত কৃষক যারা খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন দৃশ্যত দেখা যায় না। তাই কৃষক পরিবারের জন্য ভাতা-পেনশনের ব্যবস্থা বাজেটে রাখতে হবে। যেমন ভারতের কেরালা রাজ্যেও কমিউনিস্ট সরকার কৃষকদের জীবনমান রক্ষার জন্য বহু আগে থেকেই এ ব্যবস্থা চালু রেখেছে, যা প্রশংসনীয়। বর্তমানে করোনার সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকা গ্রহণের প্রাধিকারের তালিকায় কৃষক ও গ্রামবাসীদের সংযুক্ত করতে হবে। আশা করা যায় বাজেটসংক্রান্ত এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই হউক সবার প্রত্যাশা।

(৫) করোনা মোকাবিলায় সরকার চারটি কৌশলের পথ অবলম্বন করা হয়েছে, (ক) সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দেওয়া; (খ) ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রদান; (গ) কর্মহীন হতদরিদ্রকে সুরক্ষা দিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আকার বৃদ্ধি; (ঘ) বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি। দেশে সরকারি খাতে কর্মসংস্থান মাত্র ৩.২ শতাংশ অথচ এই সংখ্যাটি মালয়েশিয়াতে ২২.৪ শতাংশ, মিয়ানমার ৬.২ শতাংশ, পাকিস্তান ১২.২ শতাংশ ও ফিলিপাইন ৮.৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৯.৮ শতাংশ (উৎস: এশিয়া প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সোশ্যাল আউটলোক, ২০১৮)। আগামী অর্থবছরে সরকারি

খাতে কর্মসংস্থান এক শতাংশ বাড়ানো যাবে কি না এই করোনাকালে তা বলা কঠিন। কারণ বৈদেশিক বিনিয়োগ নিম্নমুখী, ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ ঊর্ধ্বমুখী, ব্যাক্তিখাতে বিনিয়োগ নিম্নমুখী বিধায় কর্মসংস্থান হয় না। অথচ দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেসরকারি বিনিয়োগ। গ্রামীণ অর্থনীতি সচলে রাখতে পল্লীসমাজ সেবার জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। তা যদি ঋণ হয়, তবে কম সুদে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ কর্মবাজারে প্রবেশ করে এবং শহরে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা বেশি, যাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।

৬. করোনাকালের অর্থনীতি থেকে শিক্ষণীয়

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে অনেক আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয় উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ বাংলাদেশ। একটি দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে রয়েছে, তার একটি নিয়ামক হলো মোট দেশজ উৎপাদকের (জিডিপি) হার, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক স্তর বিবেচনা করে তা নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রবৃদ্ধি মানে উন্নয়ন না। কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গাণিতিক সূচক হিসাবে জিডিপির ধারনার প্রথম প্রস্তাব করেন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ সায়মন কুজনেট ১৯৩৭ সালে, যেখানে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন জিডিপি কীভাবে একটি দেশের সার্বিক অর্থনীতি উন্নতি ও অবনতি নির্দেশ করে। তার মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জিডিপি শুধু আর্থিক অবস্থার সূচক উন্নয়ন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আইএমএফ বিশ্বব্যাংক একযোগে জিডিপিকে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে এটাকেই উন্নয়নের পরিমাপ ভ্রান্তি ধারণাকে সঠিক বলে গ্রহণ করে নেয় । তবে অনেক গবেষকই উন্নয়নে পরিমাপের ভান্তি ধারণার সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন, যার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন মোজেস আব্রামোভিজ, যিনি ১৯৫৯ সালেই এর সমালোচনা করছেন । আর ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিজ জিডিপিকে বাতিল করার আহ্বান জানান। তবে পঞ্চাশ দশকের ধ্রুপদি উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা বলেন, টেকসই উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ শ্রমসাধ্য অথচ দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি অপরিহার্য এবং অর্থনীতিবিদ পেইকাং, রয় এফ হ্যারোড, ইভজি ডোমার ও রার্বট সলো দেখিয়েছেন, দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি কতটা জরুরি। তাদের বক্তব্য ছিল কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা কৃষক জানেন ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য যা দিয়ে জমি, কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যায় যেখানে থেকে বেশি ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়। অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে চীন দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের শুরু করে, যার ফলে সত্তুরের দশকের শেষ দিক থেকে চীনের জিডিপি কখনো ২০ শতাংশের নিচে নামেনি, যা ২০০৮ সালে ৫২ শতাংশ পর্যন্ত পৌছানোর ঘটনা ঘটে, যার জন্য একটি দেশকে তার নিজস্ব সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার জন্য উৎপাদনসক্ষমতা বাড়ানো হবে, যা খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শিল্পায়ন সংগঠিত হবে, যা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পারেন না।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থাটা অনেকটা সুবিধাজনক পর্যায়ে থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি এর টেকসই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় বিষেশত বৈশ্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায়। তারপরও আলোচনায় আসে বাংলাদেশের এখন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। মোট দেশজ উৎপাদনের জিডিপি আকারে গত দুই যুগে সিঙ্গাপুর ও হংকংকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের এই অবস্থানে উঠেছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিপি) ২০১৮ সালের এক হিসাব মতে বাংলাদেশের মোট ৭০ হাজার ৪১৬ কোটি ডলার

সমপরিমাণ পন্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়েছে । বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) মতে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়ন করছে ও সামষ্টিক অর্থনতি শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বছরে (২০১৯-২০) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ হারে এবং সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ২০২৩-২৪ সালে এই প্রবৃদ্ধি হারকে ডবল ডিজিটে নিয়ে যাওয়া। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, কোনো দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ৭ বছর ধরে ৭ শতাংশে অধিক জিডিপি অর্জন করলে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়, যা বাংলাদেশ ২০২১ সালে অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এখন আর কৃষিপ্রধান দেশ বলা যায় না। বাংলাদেশ এখন সেবাপ্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত, যেখানে এই খাতের অবদান জিডিপির ৫৩ শতাংশ, শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশ এবং কৃষিখাতের অবদান ১৪ শতাংশ যদিও এখন পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষির সাথে দারিদ্র্য ও খাদ্যনিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণা বলছে, কেবল জমির কিংবা কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোই দরিদ্র, আবার মহিলাপ্রধান গৃহস্থালি পরিবারগুলোই দরিদ্র, যার সংখ্যা বিবিএসের (২০১৯) তথ্যমতে মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ, যা সংখ্যা-তথ্যের ভিত্তিতে ৩ কোটি ৬৫ লাখ। আবার হতদরিদ্রের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ অর্থাৎ ব্যাপক গণদারিদ্র্য বাংলাদেশে একটি বড় বৈশিষ্ট্য, যা বিশ্ব ব্যাংকের দারিদ্র্য ও অংশীদার ২০১৮ শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ্য রয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে দেশের হতদরিদ্র সংখ্যা ২.৪১ কোটি, যারা দৈনিক ৬১.৬০ টাকা করে আয় করতে পারে না। অথচ টেকসইভাবে দরিদ্র নিরসনের জন্য বাংলাদেশের প্রায় ৬ কোটি ২১ লাখ মানুষকে দ্রুত দৈনিক প্রায় ২৫২ টাকা করে আয়ের সংস্থান করতে হবে। অথচ আয়ের বৈষম্য এত প্রকট যে ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর স্থানে রয়েছে। সারা বিশ্বে আয় বৈষম্য নির্ধারণে গিনি সূচক, যা বর্তমানে ০.৫০ এর উপরে রয়েছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেশের গিনি সূচকে ০.৫০ পর্যায়ে গেলেই বাংলাদেশ বিশ্বের আয় বৈষম্য দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, তা দেশের জন্য সম্মানজনক নয়। আবার বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় আরও একটি সীমাবদ্ধতা হলো দীর্ঘমেয়াদি আয় বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে। এখানে উল্লেখ্য, দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করে ২০১৯ সালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জী তার (Poor Economics) বইতে উল্লেখ্য করেছেন যে, বিদেশি বিনিয়োগ বা সাহায্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা দারিদ্র্য দূরীকরণের স্বপক্ষে কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। একইভাবে (Trickle Down Effects) ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের মতো দেশে যেখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকল্পের মূল অর্থের জোগান আসে কর সঞ্চয় অর্থ থেকে। তাই এই গবেষক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই সম্ভাবনার দিকে, যেখানে সরকারি প্রকল্পের ভর্তুকি দরিদ্র মানুষের কাজে লাগে না কখনো তা গরিব মানুষের নিজস্ব চাহিদা-জোগানের বৈশিষ্ট্যের জন্য, আবার কখনো প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে, যা দারিদ্র্যকে প্রলম্বিত করে, দুষ্টচক্রে সে আটকে পড়ে নিজের কারণেই। দরিদ্র মানুষ অনেক সময়েই সঞ্চয় করতে পারে না সমাজে অসাম্য থাকার কারণে এবং এই সামান্য সঞ্চয় অবলম্বন করে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেক সময় চলে যাবে। সেই কারণেই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার করা বিপজ্জনক এবং এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবিমুখতা বা মন্দ গ্রহীতাকেই তারা দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন দারিদ্র্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নের সুফল ও সম্ভাবনা বিষয়ে অধিকতর তথ্য আহরণ ও বিচ্ছুরণ করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির লভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ তথ্যের আহরণ ও লভ্যতা দ্রুততর ও সফলতার প্রবৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ নিতে আমাদের সন্দীপিত করবে। দরিদ্রদের জীবনের সর্বদিকের দায়িত্ব থেকে সামাজিক বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে যুক্ত রেখে যথার্থ প্রবৃদ্ধি ও অনুকূলে তাদের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

৭. উপসংহার

সর্বশেষে বলা যায়, করোনাকালীন বাজেট ও সরকারের করোনা ব্যবস্থাপনা অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও তা সামলাতে সক্ষম হয়েছে যদিও করোনার সংক্রমণ ১ শতাংশের কিছু বেশি রয়েছে। করোনা আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে, যা প্রতিপালিত হলে সমাজজীবনে অনেক সমৃদ্ধি আসবে এবং এটাই অর্থনীতির জন্য মঙ্গলকর।